1.4 বিপর্যয় (Disaster) :

বিপর্যয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ Disaster শব্দটি ফরাসি শব্দ "*Disastre*" থেকে উদ্ভূত, যেখানে "*Des*" (গ্রিক শব্দানুযায়ী 'dus') অর্থে অশুভ বা মন্দ (Evil) এবং "*Aster*" অর্থে তারা (star)-কে বোঝায়। প্রাচীন কালে গ্রিক দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো, সর্বদা কোনো এক অশুভ তারা বা নক্ষত্রের প্রভাবকে ইঙ্গিত করত, যার মধ্য দিয়েই এই বিপর্যয় বা "Disaster" শব্দটি উঠে আসে।

1.4.1 সংজ্ঞা (Definition) :

দুর্যোগের মতো বিপর্যয় শব্দটিকেও একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন—

❒ আভিধানিক সংজ্ঞা (Dictionary Bases Definition) :

- Chambridge Dictionary-তে বিপর্যয়কে "an event causing great harm, damage or suffering" রূপে গণ্য করা হয়েছে।
- Merriam Webster-এ বলা হয়েছে, বিপর্যয় হল "a sudden calamitous event bringing great damage, loss or destruction."

❒ ভৌগোলিকদের সংজ্ঞা (Geographer's Definition) :

- 1997 খ্রিস্টাব্দে S. Mayhew তাঁর A Dictionary of Geography গ্রন্থে বিপর্যয় সম্পর্কে বলেছেন, "It is an unexpected threat to humans and/or their property."
- 2001 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ভারতীয় ভূগোলবিদ Savindra Singh বলেছেন "Disaster is a sudden adverse or unfortunate extreme event or danger whereas human beings as well as plants and animals." অর্থাৎ, বিপর্যয় আকস্মিকভাবে সৃষ্ট একটি প্রতিকূল বা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, যার চরম প্রভাব মানুষের সঙ্গো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যেও পড়ে।
- 2007 খ্রিস্টাব্দে M. H. Middleman তাঁর "Natural hazards in Australia"-তে বলেছেন "*A hazard is a source of potential harm or a situation with a potential to cause loss. It may also be referred to as a potential or existing condition that may cause harm to people or damage to property or the environment.*"

❒ প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞা (Institutional Definition) :

- 2002 খ্রিস্টাব্দে World Health Organisation (WHO) তাদের "World Disaster Report"-এ বিপর্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে—
  "*A disaster is an occurrence disrupting the normal conditions of existence and causing a level of suffering that exceeds the capacity of adjustment of the affected community.*" অর্থাৎ, বিপর্যয় একটি ঘটনা, যা দুর্ভোগের স্তর বৃদ্ধি ও সম্প্রদায়গত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ব্যাহত করে, জীবনযাত্রার সাধারণ পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করে।
- United Nation বিপর্যয় প্রসঙ্গো বলেছে—"*A serious disruption of the functionning of a community or a society causing widespresd human, material, economic and environmental losses which exceeds the ability of the affected communities or societies to cope with its own resources.*"

● বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

বিপর্যয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) বিপর্যয়ের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে, এই ব্যাঘাত হতে পারে অপ্রত্যাশিত, ব্যাপকতর অথবা দ্রুত বা ধীরগতিসম্পন্ন।

(ii) বিপর্যয় মানুষের জীবন, জীবনযাত্রার ও সম্পদের ওপর প্রভাব ফেলে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যের আঘাত হানে।

(iii) বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায় সামাজিক কাঠামো তথা ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি।

(iv) বিপর্যস্ত অবস্থায় সমাজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে খাদ্য, আশ্রয়, স্যানিটেশন, চিকিৎসা, বস্ত্র ও সামাজিক পরিচর্যা। এজন্য দুর্গত স্থানে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

■ **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (Disaster Management) :** কোনো একটি স্থানে যখন দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেই স্থানে পরবর্তী সময়ে যেন দুর্যোগ সংঘটিত না হয় সেজন্য কতকগুলি দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়। 10 অক্টোবর হল বিশ্ব দুর্যোগ লঘুকরণ দিবস।

বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাগুলি প্রচলিত তা হল—

1. ঝুঁকির মূল্যায়ন (Risk Assessment) : কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কী কী ধরনের ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে তার সম্ভাব্য কারণ, প্রতিকার কী আছে তার মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।

2. পরিকল্পনা (Planning) : যদি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তার সম্ভাব্য কারণ, সময় ও ব্যাপকতা জানা যায় তাহলে অতি সহজেই তার মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

3. সতর্কীকরণ (Warning) : এমন সব বিপর্যয় আছে যেখানে সতর্কীকরণের কোনো সময় থাকে না। তাই সতর্কীকরণ এমন একটি কাজ যা সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে সঠিকভাবে সঠিক মানুষকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জানানো ভীষণ প্রয়োজন।

4. জনশিক্ষা (Education) : সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষে মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি করা এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়িত্বশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি কাজ।

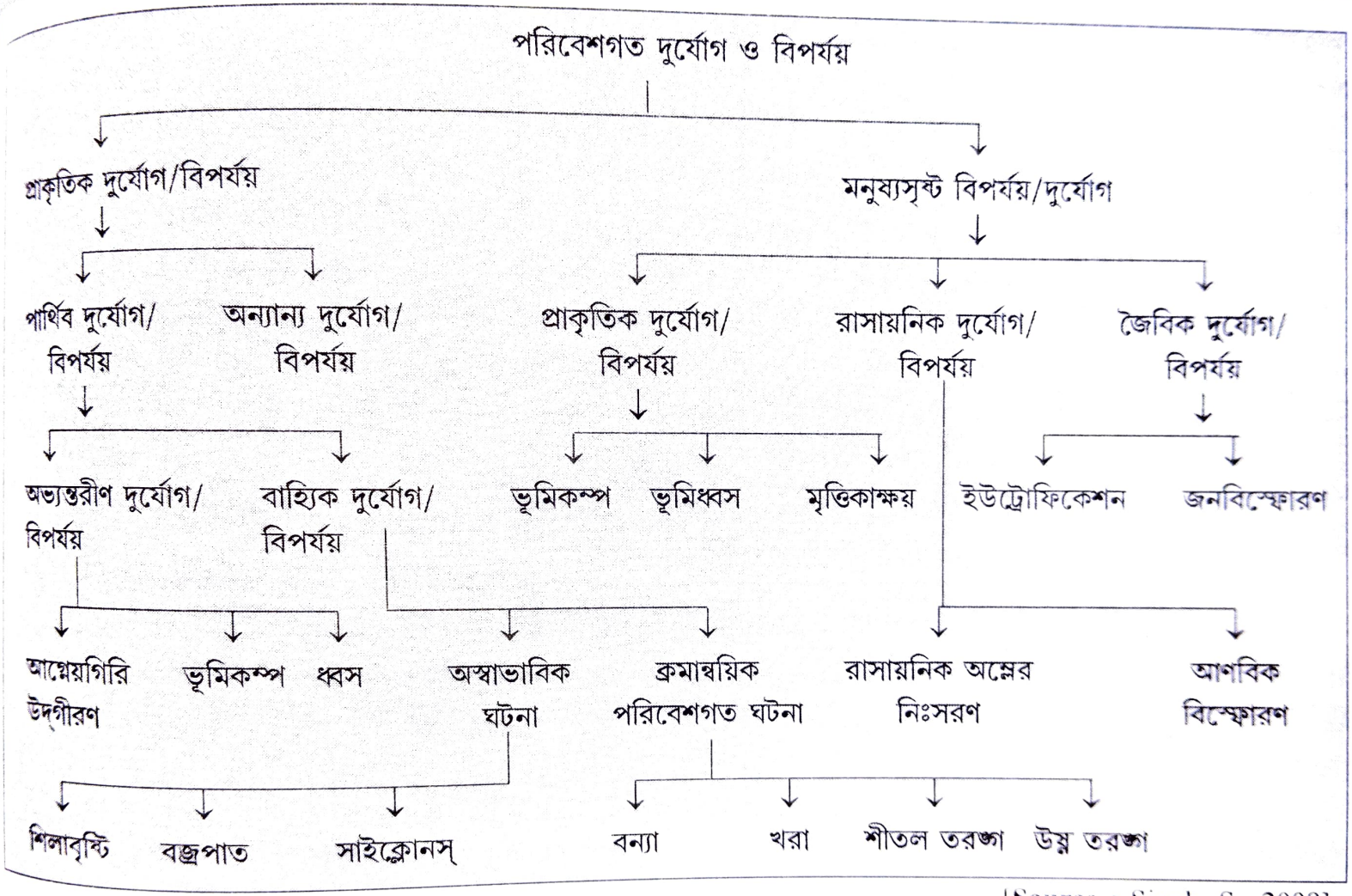

[**Source** : Singh, S., 2008]

10.3.2 *বিপর্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Disaster) :*

বিপর্যয়কে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

1. প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster)
2. মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় (Manmade Disaster)।

❶ **প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster)** : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উৎপত্তিতে সম্পূর্ণভাবে মানুষের কোনো ভূমিকা থাকে না।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তি এর উৎপত্তির প্রধান কারণ। তবে যে-কোনো বিপর্যয়ই হোক না কেন ক্ষয়ক্ষতি এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন ধরনগুলো নীচে তালিকা আকারে উল্লেখ করা হল—

(ক) **জলবায়ু সংক্রান্ত** : ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, হ্যারিকেন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (সুনামি) প্রভৃতি। (খ) **ভূগোলকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত** : ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ, ধ্বস, হিমবাহ ইত্যাদি। (গ) **জলের সঙ্গে সম্পর্কিত** : বন্যা, বজ্রপাত, খরা, জোয়ার। (ঘ) **অন্যান্য** : দাবানল বা আগুন।

❷ **মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়** (Manmade Disaster) : যে বিপর্যয়গুলির সাথে মনুষ্যসমাজ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে সেইগুলি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। যেমন—(ক) যুদ্ধ, দাঙ্গা, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, অন্তর্ঘাত, হামলা প্রভৃতি, (খ) যান দুর্ঘটনা, যেমন—রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি, (গ) পরমাণু বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, (ঘ) শিল্পজাতীয় দুর্ঘটনা, যেমন—গ্যাস লিক, গ্যাস চেম্বার বিস্ফোরণ, বয়লার বিস্ফোরণ প্রভৃতি, (ঙ) আগুন ও দাবানল, (চ) ভূমিক্ষয়, (ছ) জলদূষণ, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ, (জ) অরণ্যচ্ছেদন।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা
Disaster Management

যে কোনো বিপর্যয় সামাল দেবার যে কৌশল বা প্রক্রিয়া তাকেই বলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (disaster management is a process or strategy that is implemented when any type of catastrophic even takes place.)। বাস্তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আর তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় এই বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতিকে যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা। এই চেষ্টা তিনভাবে করা যায় যথা—

A. বিপর্যয় ঘটার আগে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকে যাকে Predisaster management বলে।

B. বিপর্যয় চলাকালীন ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কিছু ব্যবস্থা যাকে Disaster occurence management বলে।

C. বিপর্যয় পরবর্তী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যাকে Post-disaster management বলে।

বিপর্যয় ঘটার আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

● বিপর্যয় প্রতিরোধ (Disaster Prevention)

কোনো অঞ্চলে বিপর্যয়ের সংখ্যা এবং তীব্রতা কমানোর ব্যবস্থাকে বিপর্যয় প্রতিরোধ (prevention) বলে (measures of eliminate or reduce the incidence or severity of emergencies of disasters.)। এই স্তরে প্রথমেই যে

অঞ্চল বিপর্যয়প্রবণ সেই অঞ্চলের সমীক্ষা করে জানতে হবে সেই অঞ্চলে কখন কোন্ ধরনের বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা বেশি। যেমন পূর্ব হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধসপ্রবণ কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল বন্যাপ্রবণ। অঞ্চলভিত্তিক দুর্যোগ প্রবণতার হিসেব নেবার পর তৈরি করতে হবে একটি মানচিত্র, যে মানচিত্র থেকে সাধারণ মানুষ জেনে নিতে পারবে কোন্ অঞ্চলে কোন্ ধরনের বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা বেশি এবং কোন্ অঞ্চলে বিপর্যয় ঘটলে নিরাপদ স্থান হিসাবে আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ হিমালয় অঞ্চলে গত একশো বছরে সংগঠিত ভূমিকম্পগুলোর Epi-Centre পর্যালোচনা করে বসতির পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। কিংবা ভূমিধস অঞ্চলের মানচিত্র দেখে নির্মাণ কার্যকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

• বিপর্যয় উপশম (Disaster Mitigation)

বিপর্যয় উপশম ব্যবস্থা (mitigation measures) বলতে বোঝায় বিপর্যয়ের ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কৌশল যা বিপর্যয়ের পূর্বে বা বিপর্যয় চলাকালীন গ্রহণ করা যেতে পারে (disaster mitigation measures are those that eliminate or reduce the impacts and risks of hazards through proactive measures taken before an emergency or disaster occurs.)। এগুলি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা যার প্রয়োগে বিপর্যয়ের প্রভাব অনেকখানি কমানো সম্ভব হয় (it involves long term measures to reduce the effects of disaster causing phenomena.)। একাজের জন্য যে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল যথা—(i) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পূর্বাভাস দেবার ব্যবস্থা করা, (ii) সচেতনতা ও প্রস্তুতি বাড়ানো, (iii) গ্লোবাল পজিসনিং সিস্টেম (GPS), জেনারেল পকেট রেডিও সার্ভিস (GPRS), রিমোট সেন্সিং (RS) প্রযুক্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে পূর্বাভাস পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা। (iv) ত্রাণ ও উদ্ধারের ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা। (v) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য উন্নততর ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি।

• বিপর্যয় প্রস্তুতি (Disaster Preparedness)

বিপর্যয় প্রস্তুতি বলতে বোঝায় বিপদসংকুল এলাকার মানুষজন ও পরিষেবা বিপর্যয়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাপনা (measures to ensure that communities and services are capable of coping with the effects of disasters.)। অর্থাৎ বিপর্যয় প্রস্তুতি বলতে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানোর জন্য কিছু কর্মসূচি নেওয়া। এই কর্মসূচির মধ্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, জনশিক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদিকে বোঝায়। বিপর্যয়ের পূর্বে এই প্রস্তুতি থাকলে বিপর্যয় চলাকালীন মানুষের ভয়, আতঙ্ক প্রভৃতি সহজেই দূর হয় (preparing for a disaster can reduce the fear, anxiety and losses that disasters cause.)। সেই কারণে প্রস্তুতি সংক্রান্ত কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলিকে তৈরি রাখা। এব্যাপারে সরকারি স্তরে বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বয় গড়ে রাখা একান্ত জরুরি। তাছাড়া একটি বিপর্যয় তহবিলও গড়ে রাখা প্রয়োজন। গড়ে রাখা দরকার সেনাবাহিনীর মতো একটি ত্রাণ ও উদ্ধারের বাহিনী।

বিপর্যয় চলাকালীন বা বিপর্যয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

1 প্রতিক্রিয়া (Response) : প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমেই আসে দুর্যোগ চলাকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী বা ক্ষণস্থায়ী দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বা উদ্ধারকার্য। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ব্যবস্থা নিলে ক্ষয়ক্ষতি যেমন কমানো যায় তেমনি ক্ষয়ক্ষতির আতঙ্ক থেকে মানুষজনকে দূরে রাখা যায় (measures taken in anticipation or during and immediately after a disaster to ensure that effects are minimized)।

বিপর্যয় যদি ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির হয় তাহলে বিপর্যয় চলাকালীন ব্যবস্থা বলতে দুর্যোগের অব্যবহিত পরের ব্যবস্থাদি; যেটি মূলত উদ্ধার কার্য, যেমন ভূমিকম্প বা টর্নেডোর কথা বলা যেতে পারে। এদের স্থায়িত্ব কয়েক সেকেন্ড থেকে বড়োজোর কয়েক মিনিটের। এসব ক্ষেত্রে বিপর্যয় চলাকালীন কোনো ব্যবস্থা নেবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য উদ্ধার ও ত্রাণকার্য একসঙ্গে করা যায়। যেমন বন্যা। বন্যার সময় একদিকে জলময় অঞ্চলগুলি থেকে মানুষ, পশু, সম্পত্তি ইত্যাদি উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হয়, তেমনি ত্রাণশিবিরে রেখে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হয়।

2 পুনরুদ্ধার (Recovery) : এটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত পর্যায়। এক্ষেত্রে বিপর্যয় এলাকার পুনর্গঠন (reconstruction) এবং বিপদগ্রস্ত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন (rehabilitation) সংক্রান্ত কাজকর্মকে বোঝায় (measures that support emergency and help the affected communities in the reconstruction of the physical infrastructure and reconstruction of economic and emotional well being.)। প্রথমেই রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হয়। তারপর ভেঙে যাওয়া বাড়ি, স্কুল, কলেজ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে আক্রান্তদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি তথা পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লোকজন কাছের লোককে হারিয়ে Trauma-য় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিংবা অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি। এরপর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার স্বার্থে আক্রান্তদের শুধু বাড়িঘর বানিয়ে দেওয়া নয়, তাদের আগামী কিছুদিনের জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। এই সবটাই পুনরুদ্ধারের (recovery) মধ্যে পড়ে।

বিপর্যয়কে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের খুব একটা নেই তবে বিভিন্ন স্তরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে। এবং এর জন্য দরকার সঠিক পূর্ব পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। এই প্রস্তুতি থাকলে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ঝুঁকি (risk)-কে কিছুটা অন্তত হ্রাস করা যায়, সন্দেহ নেই।

10.6.4 *বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতি (National Policy on Hazard Management) :*

দুর্যোগ ও বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নানা পেশায় নিযুক্ত মানুষের ভূমিকাকে Flow chart-এ দেখিয়েছেন পিটারসন (1996) প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র 10.16)-এ এবং দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের আদর্শ মডেলকে স্মিথ (1991) (চিত্র 10.17)-এ যেভাবে দেখিয়েছেন তা নীচে উল্লেখ করা হল—

১। যে-কোনো বিপর্যয়ের সময় দ্রুত উদ্ধারকার্য এবং ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো।

২। বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো এবং সামাজিক ঐক্যমত গড়ে তোলা।

৩। প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। মানুষ ও সম্পদের উন্নয়ন রক্ষা।

৫। জনশিক্ষা বৃদ্ধি ও মানুষের বিপর্যয় মোকাবিলায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

৬। জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল কমিটি বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা।

৭। বিভিন্ন গবেষণায় সাহায্য করা।

৮। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

৯। দুর্যোগ, বিপর্যয়, ঝুঁকি প্রবণ মানচিত্র তৈরি করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন করা।

4.2 বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-2005 (Disaster Management Act-2005) :

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর পরিচালনায় এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মতিক্রমে 2005 খ্রিস্টাব্দের 23 ডিসেম্বর 'Disaster Management Act' প্রণীত হয়।

○ *উদ্দেশ্য (Aim) :* বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

1. সমস্ত ধরনের উদ্ভাবনী কৌশল দ্বারা যে-কোনো ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধ।
2. যথাযথ সময়ে বিপর্যয়ের জন্য আগাম প্রস্তুতিকরণ।
3. দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের সমস্ত ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসন।
4. সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা বিপর্যস্তদের দ্রুত উদ্ধার, ত্রাণ সরবরাহ।
5. বিপর্যয়ে উদ্ধারকৃত মানুষজনদের পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন।
6. বিপর্যয়োত্তরকালে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্গত মানুষদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া।

❐ *আইনের বিভিন্ন অধ্যায় (Different chapter of the Act) :*

2005 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন 11টি অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণটি নীচে উল্লেখ করা হল।

➢ *প্রথম অধ্যায় (Chapter-I) :* আইনের প্রথম অধ্যায়ে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের শিরোনাম, ঘোষণাপত্র, বিপর্যয়ের সংজ্ঞা ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একাধিক পরিভাষা (Terminology) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

➢ *দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter-II) :* আইনের এই অধ্যায়টি জাতীয় স্তরে 'NDMA' বা "National Disaster Management Authority' গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আইনে বলা হয়, মোট 9 জন সদস্য সহকারে 'NDMA' গড়ে উঠবে, যার চেয়ারপার্সন থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই সংস্থার ওপর বেশ কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, যেমন—

(i) জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রদান,
(ii) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা,
(iii) বিপর্যয় প্রশমনে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রদান,
(iv) বিভিন্ন দুর্যোগ বা বিপর্যয় নিরসনে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ,
(v) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন নীতি নির্দেশনামা প্রদান ও পরিচালনা,
(vi) সর্বস্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক বিভিন্ন কৌশলগত শিক্ষা ও জনসচেতনতার প্রসার,
(vii) বিভিন্ন রাজ্য ও জেলাস্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সহায়তা প্রদান ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়সাধন প্রভৃতি।

চিত্র 4.10 : NDMA-র প্রতীক

➢ *তৃতীয় অধ্যায় (Chapter-III) :* তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়, প্রতিটি রাজ্যেই 'SDMA' বা "State Disaster Management Authority" গড়ে তুলতে হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র দিল্লি বাদে, বাকি সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করবে 'Legislative Assembly'। এই অধ্যায়ে আরও বলা হয়—

(i) প্রতিটি রাজ্যে "Disaster Management Policy"-র উন্নতি ঘটাতে হবে।

(ii) একটি নির্দিষ্ট বিধি মেনে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে বিপর্যয় মোকাবিলায় অংশ নিতে হবে।

(iii) রাজ্যে "Minimum Standard of Relief"-এর একটি নির্দিষ্ট বিধি তৈরি করতে হবে।

(iv) প্রতিটি রাজ্যের "State Executive Committee" পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত সভার মাধ্যমে বিপর্যয় পরিচালনা সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব পালন করবে। যেমন—বিপর্যয় প্রবণ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও বিপন্নতার মানচিত্র তৈরি, বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতিভিত্তিক সামর্থ্য গঠন প্রভৃতি।

➢ *চতুর্থ অধ্যায় (Chapter-IV) :* এই অধ্যায়ে বলা হয়, প্রতিটি জেলায় 7 জন সদস্যের একটি 'District Disaster Management Authority' গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র কাজের দায়ভার থাকবে 'D. M' বা "District Magistrate"-এর হাতে।

(i) প্রতিটি জেলার বিপন্নতা চিহ্নিত করে, কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সমস্ত পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে সেগুলিকে যথাসময়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(ii) সচেতনতার জন্য "Community Training" এবং "Early Warning System"-কে সর্বস্তরে ব্যবহার করবে।

(iii) স্থানীয় স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত সভা আয়োজন করে তদারকি করবে।

(iv) বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করবে।

➢ *পঞ্চম অধ্যায় (Chapter-V) :* বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের পঞ্চম অধ্যায়টিতে ভারত সরকারের বিপর্যয় সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানের বিধি আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে—

(i) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রী স্তরের দায়ভার।

(ii) রাজ্য ও জেলাস্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ কৌশলগুলিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রভৃতি।

➢ *ষষ্ঠ অধ্যায় (Chapter-VI) :* এই অধ্যায়টিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (Local Authority) সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলার দায়ভার স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে—

(i) স্থানীয় আধিকারিক বা কর্মীবৃন্দদের বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(ii) পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার ও বিপর্যস্ত অঞ্চলে সেগুলি বণ্টন।

(iii) কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলাস্তরের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়দায়িত্ব মেনে ত্রাণ সরবরাহ, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন প্রকল্পে অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

➢ *সপ্তম অধ্যায় (Chapter-VII) :* এই অধ্যায়ে বলা হয় কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান—"National Institute of Disaster Management (NIDM)" গঠন করবে, যাদের মাধ্যমে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার একাধিক কার্যাবলি সম্পন্ন হবে, যেমন—

(i) মানব সম্পদের উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।

(ii) বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(iii) স্কুলস্তরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ওপর কেরিয়ার গঠন প্রভৃতি।

➤ *অষ্টম অধ্যায় (Chapter-VIII) :* এই অধ্যায়ে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাবলিগুলিতে সঠিকভাবে সাড়াপ্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য "Natioanl Disaster Response Force (NDRF)" গঠনের কথা বলা হয়।

➤ *নবম অধ্যায় (Chapter-IX) :* বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের এই অধ্যায়টিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বন্টন ও অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি বিপর্যয় তহবিল (Fund) গঠনের কথা বলা হয়, যেমন—

(i) "Natioanl Disaster Response Fund"

(ii) "Natioanl Disaster Mitigation Fund" প্রভৃতি।

➤ *দশম অধ্যায় (Chapter-X) :* এই অধ্যায়ে বিপর্যয় চলাকালীন বিভিন্ন অপরাধ এবং তার শাস্তি বা জরিমানা সংক্রান্ত বিধিগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন—

(i) Punishment for obstruction,

(ii) Punishment for false claim,

(iii) Punishment for misappropriation of money or materials,

(iv) Punishment for false warning প্রভৃতি।

➤ *একাদশ অধ্যায় (Chapter-XI) :* এই অধ্যাযে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার বিবিধ বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন—*(i) Prohibititon against discrimination, (ii) Power to issue direction by central Government, (iii) Powers to be made available for rescue operations, (iv) Making or amending rules etc., in certain circumstances, (v) Power of requisition of resources, provisions, vehicles etc., for rescue operations etc. (vi) Payment of compensation, (vii) Direction to media for communication of warnings etc. and Authentication of orders of decisions, (viii) Delegation of powers, (ix) Annual report, (x) Bar of jurisdiction of court, (xi) Act to have overriding effect, (xii) Action taken in good faith, (xiii) Immunity from legal process, (xiv) Power of Central Government to make rules, (xv) Power to make regulations, (xvi) Rules and regulations to be laid before Parliament, (xvii) Power of State Government to make rules, (xviii) Power to remove difficulties* প্রভৃতি।

❐ A CASE STUDY

একটি পর্যালোচনা : ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (Bhopal Gas Accident) :

বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া শিল্পগত বিভিন্ন বিপর্যয়গুলির মধ্যে, ভারতবর্ষের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। নিম্নলিখিত আলোচনায় এই ঘটনার মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে উল্লেখ করা হল।

➤ *মূল ঘটনা (The Main Facts) :* 1984 খ্রিস্টাব্দের 3 ডিসেম্বর মধ্যরাতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল শহরে অবস্থিত সেভিন নামক কীটনাশক প্রস্তুতকারক Union Carbide Corporation-এর কারখানার MIC গ্যাস ভরতি ট্যাঙ্কে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর ফলে মৃত্যু দূতের ন্যায় MIC গ্যাস মুহূর্তের মধ্যে আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটায়।

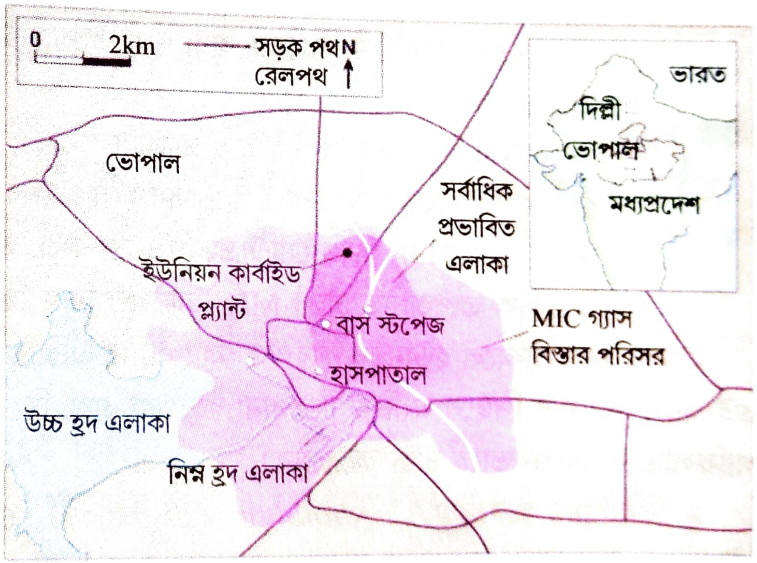

চিত্র 13.32 : মানচিত্রে ভূপালে বিস্ফোরণ প্রভাবিত এলাকা

➤ *প্রেক্ষাপট (Background) :* ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটটি তার স্থাপন কালের বহু আগে থেকেই ছিল খুবই স্পষ্ট। কারণ তৎকালীন সময়ে বহুজাতিক ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানাটি বিশ্বের প্রায় 127-টি দেশে গড়ে উঠলেও, সেভিন নামক বিষাক্ত কীটনাশকটি মানুষ ও পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়ায়, 1972 খ্রিস্টাব্দের পর কানাডা সরকার এই গ্যাস উৎপাদনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ অরোপ করে। কিন্তু ভারতবর্ষে তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সেই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই,

ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির পুরানো যন্ত্রাংশের সহায়তায় 1980 খ্রিস্টাব্দে ভোপালের কারখানাটি গড়ে তোলে।

কিন্তু 1982 খ্রিস্টাব্দে সংশ্লিষ্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পর্যদ ভোপাল কারখানার বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ করে, একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে জমা দেয়। তাতে বলা হয়—

- এখানে শ্রমিকরা মাটির নীচের ট্যাঙ্কে যে পদ্ধতিতে MIC গ্যাস ভরতি করে থাকে, তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।
- সংশ্লিষ্ট ট্যাঙ্কটিতে গ্যাসের চাপ মাপার নির্দিষ্ট কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে না।
- কারখানার আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাটিতেও অসঙ্গতি ছিল।
- তা ছাড়া, কারখানার আশেপাশের বসতি অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তাগত ক্ষেত্রটিও বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

➢ *প্রধান কারণ (The main reason)* : বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য বিশেষ যে কয়েকটি কারণকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন, সেগুলি হল—

(i) ভোপালের সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক কারখানায় কীটনাশক তৈরির জন্য মোট 68,000 লিটার গ্যাস ভরতি তিনটি ট্যাঙ্কে (E610, E611 এবং E619) মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু 1984 খ্রিস্টাব্দের 30 নভেম্বর E610 নামক ট্যাঙ্কটির ভাল্বে প্রথম ত্রুটি ধরা পড়ে।

(ii) নাইট্রোজেন গ্যাসের চাপগত ভারসাম্য সঠিকভাবে বজায় রাখতে ওই ট্যাঙ্কগুলিতে তরল MIC ভরতির অনুমোদিত মাত্রা ছিল প্রায় 30 টন। কিন্তু যে ট্যাঙ্কটি থেকে দুর্ঘটনার সূত্রপাত ঘটে, সেটিতে তরল MIC ভরা হয়েছিল প্রায় 42 টন।

(iii) শক্তি ও মূলধন বাঁচানোর স্বার্থে নাইট্রোজেন উৎপাদন এবং শ্রমিক সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমানো হয়েছিল।

(iv) ভোপালের সংশ্লিষ্ট কারখানাটিতে নিয়োজিত স্বল্প সংখ্যক শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তাতে উৎপাদন ক্ষেত্রটিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ছয়মাস অন্তর কারখানার যন্ত্রাংশগুলিকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

(v) ট্যাঙ্কের MIC রাসায়নিকটিকে নিষ্ক্রিয় রাখতে, একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে তাতে কস্টিক সোডা ব্যবহার করা হত। কিন্তু দুর্ঘটনার দিন কস্টিক সোডা ফুরিয়ে যাওয়ায়, মিক নিষ্ক্রিয়করণ কক্ষটি অচল হয়ে পড়েছিল।

(vi) বিপর্যয়ের আগের দিন ট্যাঙ্কে জল দিয়ে পরিষ্কার করা হলেও, ট্যাঙ্কটিকে শুকনো না করার দরুন MIC এবং ফসজিন গ্যাসের অবাঞ্ছিত তাপমোচী বিক্রিয়ায়, ট্যাঙ্কের ভিতর তাপ প্রচণ্ড পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

(vii) ভোপালের সংশ্লিষ্ট কারখানাটিতে গ্যাসটিকে ঠান্ডা করার ক্ষেত্রে তরল নাইট্রোজেন পাঠানো, বা উপযুক্ত রেফ্রিজারেটারের প্রয়োগক্রিয়া প্রায় তিন মাস ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা যেখানে 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়ার কথা, তা 15-20° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়। এর ফলে অত্যধিক তাপজনিত চাপে MIC ট্যাঙ্কের ভাল্ব ছিটকে গিয়ে দুর্ঘটনাটিকে অনিবার্য করে তোলে।

ঘটনার পরবর্তীকালে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার Edward Munoz এক বিবৃতিতে এই গ্যাস দুর্ঘটনার পিছনে সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং নিয়োজিত কর্মচারীদের উভয়েরই বেশ কিছু কর্তব্যগত গাফিলতিকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন।

➢ *বিপর্যয়ের ঘটনাক্রম (Chronology of disasters)* : ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়টিকে নিম্নলিখিত ঘটনাক্রমে উপস্থাপন করা হল।

◉ রাত 12 টা : ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার ভূগর্ভে মজুত মিথাইল আইসো সায়ানেট সমৃদ্ধ ট্যাঙ্কের একটি ভাল্ব প্রচণ্ড চাপের কারণে ভেঙে যায়। এর ফলে ওই ট্যাঙ্কারে থাকা প্রায় 40 টন বিষাক্ত মিথাইল

আইসোসায়ানেট গ্যাস প্রচণ্ড বেগে আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় অংশে ঘন মেঘের ন্যায় ধূমায়িত একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে।

- **রাত 1 টা :** এরপর কারখানার আশেপাশে স্থানীয় বস্তিবাসীরা লঙ্কা পোড়ানোর মতো ঝাঁঝালো তীব্র গন্ধ অনুভব করে। ভারী বিষাক্ত গ্যাস চারপাশের বাতাসকে ভর করে দ্রুত বেগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের চোখ-নাক জ্বালা শুরু হয়ে যায়। ফলে কোনো কিছু বিবেচনা না করেই কয়েক হাজার মানুষ গভীর রাতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার পর সেখানকার মানুষ বিপর্যয়স্থল থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে, ততোই ঘনঘন প্রশ্বাসের সঙ্গে আরও বেশি পরিমাণ MIC গ্যাস মানব শরীরকে আক্রান্ত করতে থাকে।
- **রাত 2 টো 30 মিনিট :** সেভিন উৎপাদক কারখানার সাইরেন বেজে ওঠে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করে দেয়। শহর ও শহরতলীতে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহুমানুষ মাটিতে মৃত্যু যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে।
- **ভোর 4 টে :** দুর্ঘটনার পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যত্রতত্র অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহ সরাতে রাস্তায় চলাফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

➢ *ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk analysis) :* আমরা যদি ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় মানুষের বিপন্নতা তথা ঝুঁকির ক্ষেত্রটিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসবে। যেমন—

প্রথমত, ভোপালের ঘনবসতিপূর্ণ এমন একটি এলাকায় মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী এই কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঠিক হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্যাবসা করতে আসা বহুজাতিক এই মার্কিন সংস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ আইন সেই সময় ভারতে বিধিবদ্ধ ছিল না।

তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারও এই কারখানাটির ভয়াবহতা সম্পর্কে যথেষ্ট উদাসীন ছিল।

চতুর্থত, দুর্ঘটনাটি মধ্য রাত্রিকালীন ঘটার কারণে ঘুমের আচ্ছন্নে থাকা অধিকাংশ মানুষ এই বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

➢ *সামগ্রিক প্রভাব (Overall Effect) :* ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির এই গ্যাস দুর্ঘটনা মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরটিকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল।

তাৎক্ষণিক প্রভাব [Immediate Effects]

(i) এই দুর্ঘটনায় সরকারি হিসাব মোতাবেক প্রায় 3,787 জন মানুষের মৃত্যুর পরিসংখ্যান উল্লেখ করলেও, বিভিন্ন বেসরকারি তথ্যানুসারে সেই মৃত্যুর সংখ্যাটা ছিল প্রায় 16 থেকে 25 হাজার।

(ii) ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যে প্রায় হাজারেরও বেশি মানুষ বিষাক্ত গ্যাসের প্রকোপজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়।

(iii) সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে আহত হওয়া মানুষের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় 5 লক্ষ 68 হাজারের মতো।

(iv) মানুষ ছাড়াও এই দুর্ঘটনায় প্রায় কয়েক হাজার স্থানীয় জীবজন্তু মারা যায়।

প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রভাবে সবচেয়ে বিপর্যস্ত হয় পড়ে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলারা।

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব [Long Lasting Effects]

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার তাৎক্ষণিক ভয়াবহ প্রভাবগুলির ন্যায়, এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলিও ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। যেমন—

(i) দুর্ঘটনার কয়েক দিন পর থেকেই পড়ে থাকা পচা-গলা মৃতদেহগুলি থেকে বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়াতে থাকে।

(ii) এই ঘটনার পর স্থানীয় মাটি এবং ভূগর্ভস্থ জল ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়ে।

(iii) বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপর্যয়ের প্রায় কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি স্থানীয় মানুষ যকৃৎ ও কিডনির সংক্রমণ, অন্ধত্ব, এমনকি ক্যান্সারের মতো বেশ কয়েকটি দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে শুরু করে।

(iv) প্রসূতি মায়েদের মধ্যে জননতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

(v) নতুন করে জন্মানো শিশুরা বিকলঙ্গতা বা অন্য কোনো জটিল রোগে ভুগতে থাকে।

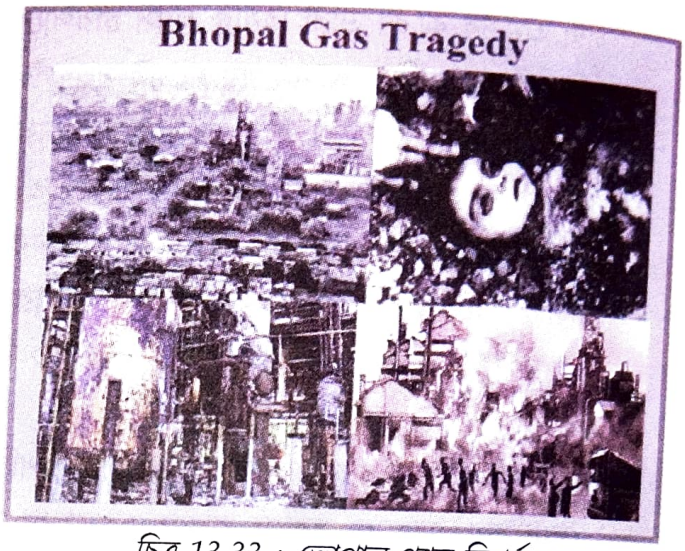

চিত্র 13.33 : ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 1984 খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার ভোপাল দুর্ঘটনাকে জাপানের হিরোসিমা পারমাণবিক দুর্ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে, একে 'ভোপোসিমা' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

➢ *গৃহীত পদক্ষেপ (Steps taken) :* যে ধরনের অবহেলার বাতাবরণে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলি একইভাবে অন্ধকারেই রয়ে যায়। কারণ এই দুর্ঘটনায় ইউনিয়ন কার্বাইডের কোনো শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। এই দুর্ঘটনার জন্য ভারত সরকার কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক ক্ষতিপূরণের আবেদন জানালেও, আদালতের বাইরে কোনো এক অদ্ভুত সমঝোতা মোতাবেক ইউনিয়ন কার্বাইড করপোরেশন 1989 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 47 কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায়ভার মুক্ত হয়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষতিপূরণের মামলা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। তৎকালীন দুর্ঘটনার কয়েকদিন পর সংশ্লিষ্ট সংস্থার চেয়ারম্যান W. Anderson ভোপালে এলে, তাকে ভারতীয় পুলিশরা গ্রেপ্তার করে। পরে তিনিও জামিন পেয়ে বিদেশে পলাতক হয়ে যান। আহতরাও সেই সময় সরকারিভাবে যে ক্ষতিপূরণ পায়, তা ছিল নিতান্তই যৎসামান্য। অবশেষে 1998 খ্রিস্টাব্দে কারখানাটি মধ্যপ্রদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বর্তমানে কারখানার এই অঞ্চলটিকে সরকারিভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

➢ *বিপর্যয়ের তাৎপর্য (The Significance of the disaster) :* শিল্পগত দুর্যোগের নিরিখে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ভারত সহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বিপর্যয় তার ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে সমস্ত শিল্প ভিত্তিক সভ্য দেশকে বেশ কয়েকটি নিরাপত্তাবিধির শিক্ষা দিয়ে গেছে, যেমন—

- যে-কোনো শিল্প স্থাপনের পূর্বে জনবসতি এবং সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।
- বসতি অঞ্চলের আশেপাশের শিল্পাঞ্চলগুলিকে পরিবেশ বান্ধব নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট কঠোর হতে হবে।
- শিল্পে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে, ভূমির ব্যবহারযোগ্যতার বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।
- সমস্ত ধরনের কারখানাকে নিরাপদ করে তুলতে, নিয়মনীতি, পরিকাঠামো এবং সতর্কীকরণ ব্যবস্থাগুলিকে জোরদার করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষ হিসেবে আমরা যদি চারপাশের বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার বিষয়ে সচেতন না হই, ভবিষ্যতের পরিণতি হবে অত্যন্ত নির্মম ও ভয়ঙ্কর।

শিল্প কারখানার

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (Bhopal Gas Tragedy) :

ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক প্রস্তুত করবার কারখানাটি ভূপাল শহরের অদূরে অবস্থিত ছিল। ১৯৮৪ সালের মধ্যরাতে দুর্ঘটনাবশত অতিবিষাক্ত MIC গ্যাস বা মিথাইল আইসোসায়ানেট (Methyl Isocyanate) প্রচুর পরিমাণে বাতাসে মেশে। এর ফলে সরকারী হিসেবে ২,৩০০ ও বেসরকারী হিসেবে ১০,০০০ লোক মারা যান। এ ছাড়া প্রায় দু লক্ষ লোক সম্পূর্ণ বা আংশিক পঙ্গু হয়ে পড়েন। আরো কয়েক লক্ষ লোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ কারখানার গায়েই ছিল হাজার হাজার মানুষের বস্তি এবং অদূরেই ঘনবসতিপূর্ণ শহর। পৃথিবীর শিল্প দুর্ঘটনার ইতিহাসে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রাণহানিকর দুর্ঘটনা।

তেজস্ক্রিয় দূষন ঃ যদিও তেজস্ক্রি য় দূষণের পরিমাণ এবং উৎস সংখ্যা কম, কিন্তু যেটুকু হয়, তাই মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর হতে পারে। আণবিক শক্তি কেন্দ্রে দুর্ঘটনা বা লিকেজ, আণবিক বর্জ্য, ইউরেনিয়ামের মতো খনিজ উত্তোলন ও ব্যবহার, অন্যান্য তেজস্ক্রিয় ব্যবহারে অসতর্কতা বিপদ্‌জনক হতে পারে। এছাড়া হাতে হাতে মোবাইল-এর ব্যবহার ও তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা না জেনে কর্ণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে লাগিয়ে ব্যবহার ক্ষতিকর বলে বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করছেন। কিন্তু এব্যাপারে মানুষের ব্যবহারে পরিবর্তন খুব একটা লক্ষ্য করা যায় নি। মানুষের শরীরে সেলফোন থেকে কি মাত্রায় তেজস্ক্রিয় ছড়ায়, সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। মোবাইল টাওয়ারগুলি তেজস্ক্রিয় ছড়ানোর আরেকটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবহুল এলাকায় মোবাইল টাওয়ার স্থাপন, বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করে তেজস্ক্রিয় দূষন হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। এজন্য মোবাইল টাওয়ার গুলিকে ঘনবসতি এলাকা থেকে দূরে স্থাপন, সেলফোনগুলিকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের থেকে খানিকটা তফাত রাখা, সেলফোনগুলির তেজস্ক্রিয়তা কমানোর জন্য বিধিনিষেধে কড়াকড়ি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি তেজস্ক্রিয় দূষন কমাতে সাহায্য করবে।

আনবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। কিন্তু বিপজ্জনক দূর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে। যেমন চেরনোবিল পরমানু কেন্দ্রের দূর্ঘটনা। এজন্য অত্যন্ত বিধিনিষেধ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়।

মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে তেজস্ক্রীয় দূষনের শিকার হয়েছে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনা (Chernobyll Tragedy) :

ইউক্রেনের চেরনোবিল-এর পরমাণুকেন্দ্রে ১৯৮৬ সালে এক ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনে পরমাণু রি-অ্যাক্টর তৈরি এবং সেদিনকার বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা, যার উপযুক্ত ছিল না এই রি-অ্যাক্টর। বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয়দ্রব্য ছড়িয়ে পড়ল সংলগ্ন অঞ্চলের বায়ু, জল ও মাটিতে। প্রায় লক্ষাধিক লোককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও এতে ২৮ জনের মৃত্যু ঘটে এবং তেজস্ক্রিয়তার বিলম্বিত প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন হাজার হাজার লোক।

১৯৯৯ সালে জাপানের টোকাইমুরা পরমাণু শক্তি কেন্দ্রেও দুর্ঘটনা ঘটে।

পরমাণু বোমা নিক্ষেপ—এর বিধ্বংসী ক্ষমতা বোঝা যায় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরদুটিতে পরমাণু

বোমা নিক্ষেপের পর। বহু লোক মারা যান। বহু লোক পঙ্গু হয়ে পড়েন। পরবর্তী প্রজন্মকেও এই অভিশাপ বহন করতে হয়।

পরমাণু বোমা পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এর ফলে বিস্ফোরণের কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরে তেজস্ক্রিয় প্রভাব পড়তে লক্ষ করা যায়। সমুদ্র তলদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্থানীয় সামুদ্রিক জীবকুল বিপন্ন হয়।

২. জলদূষণ (Water pollution) : প্রাকৃতিক জলের উৎস নদী-নালা, খাল-বিল, ভৌমজল, এমনকি সমুদ্র প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জল ধারাগুলি প্রবাহ পথে কলকারখানার বর্জ্য, খনিজ ও কৃষিজ বর্জ্য, কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত সার ও কীটনাশক বিধৌত জল, কলকারখানার অপরিশোধিত জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যবহৃত জল, গৃহস্থালির তরল বর্জ্য মিশ্রিত জল প্রভৃতি বিভিন্ন জলপ্রবাহ, জলধারা ও জলাধারগুলিকে দূষিত করছে। কলকারখানাগুলি থেকে বা গৃহস্থালি থেকে যখন দূষিত জল বাইরে আসে, তখন তার সঙ্গে যে দূষক পদার্থ মিশে থাকে, সেগুলিকে দূষনমুক্ত না করতে পারলে এই জলদূষণের সমস্যা থেকেই যাবে। এই জন্য আইন প্রনয়ন ও পাশাপাশি উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার আশু কর্তব্য।

জলদূষণের ফলে পরিবেশের অবক্ষয়, প্রাণীজগতের স্বাস্থ্যহানি ধীরে ঘটলেও কয়েকটি ঘটনা বিপর্যয়ের আকারে ঘটেছে দেখা যায়। যেমন—

পারদদূষণ : মিনামাটা রোগ (Mercury pollution : Minamata disease) : জাপানে মিনামাটা উপসাগরীয় উপকূলে একটি প্লাস্টিক পেন্ট তৈরির কারখানা থেকে পারদযুক্ত বর্জ্য তরল সমুদ্রে ফেলা হয়। ঐ বিষাক্ত পদার্থ জলে মিশে মাছের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং বহু লোক রোগাক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয় অথবা মারা যায়। এটি **মিনামাটা রোগ** (Minamata disease) নামে পরিচিত। ১৯৫৫ সালে এই ঘটনাটি ঘটে। ক্ষতিগ্রস্তরা আইনের সাহায্য নিয়ে কেবল এই দূষক বর্জ্য নিক্ষেপই বন্ধ করেনি, ক্ষতিপূরণও পায়।

আর্সেনিক দূষণ (Arsenic pollution) : সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের অনেক অঞ্চলের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এতে **আরসিনেকোসিস** নামে দূরারোগ্য ব্যাধি হয় ।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ঘটা তৈলদূষণ (Oil pollution during Gulf war) : লিবিয়া কুয়েত দখল করায় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয় (১৯৯১)। এই যুদ্ধে কুয়েতের অনেকগুলি তেলের কূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং সমুদ্রের তলদেশের পাইপলাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিপুল পরিমাণে তেল উপসাগরের জলে মেশে। বহু সামুদ্রিক প্রাণীর ও পাখির মৃত্যু ঘটে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এইভাবে বায়ুমণ্ডল ও জল দূষিত হয়।